১৭ নারী নির্যাতন

[Violence Against Women]

অধ্যায়সূচী

| | ① ভূমিকা ② মহিলাদের বিরুদ্ধে নাকাল-লাঞ্ছনা ③ নারী নির্যাতনের প্রকৃতি, পরিধি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ④ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি | |

১৭.১ ভূমিকা (Introduction)

বাইবেলে বলা হয়েছে যে একজন স্ত্রীলোকের মূল্য নির্ধারিত হবে একজন পুরুষের মূল্যের পাঁচ ভাগের তিনভাগ হারে। কয়েক দশক আগে মহিলাদের অবস্থা করুণ ছিল। কাল্পনিক মতবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাস এবং প্রচলিত ধারণায় সমাজে নারীর দূরবস্থা, তাদের অবস্থার ভয়াবহতা এবং অমর্যাদাপূর্ণ সমস্যা নতুন নয়। ভারতীয় সমাজে তাঁরা অবমাননা, যন্ত্রণা এবং শোষণের শিকার। অধ্যাপক বিশ্বনাথ ঘোষ (Biswanath Ghosh) তাঁর *Contemporary Social Problems in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "It is written in the Bible that the value of women shall be assessed at three fifths of the value of a man. Though thousands of years have elapased since the days of the Bible, situation has not changed much, women earn approximately 60 of what men earn."

সাম্প্রতিক কালে সরকার, পরিকল্পনাকার, সমাজ সংস্কারক, সমাজসেবক এবং অবশ্যই গবেষক সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা বিবিধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। সামাজিক সমস্যাদির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং তারমধ্যে মহিলাদের সমস্যা অতিমাত্রায় অর্থবহ।কারণ নারীজাতি সমস্যা-জর্জরিত হয়ে পড়লে সেই দেশ ও দেশবাসী এগোতে পারে না। মহিলারা অন্যায়-অবিচারের শিকার হলে জনজীবন বিপন্ন হতে বাধ্য। অধ্যাপক মদন (G. R. Madan) তাঁর *Indian Social Problems* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Woman is the mother of the race and is the liasion between generations. Indian culture attaches much importance to this section of the society; therefore India has been symbolised as Mother India." নারী জাতির সমস্যা বহু ও বিভিন্ন। স্বভাবতই এই আলোচনায় বার্দ্ধক্য বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, অপরাধবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনা এসে পড়ে। কিন্তু মহিলাদের সমস্যাদি সম্পর্কিত একটি বিষয় অধুনা অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এই বিষয়টি হল নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন সম্পর্কিত সমস্যাদি এবং তার মোকাবিলা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সরকার বিশেষভাবে বিব্রত। সমাজবিজ্ঞানীরাও ভারতে নারী নির্যাতন, তার প্রকৃতি এবং সুরাহার উপায়-পদ্ধতির আলোচনা ও অনুসন্ধান নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত। অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) বলেছেন: "Few topics today draw the attention of researchers in social sciences, government, planning groups, social workers and reformers as the problem of women do .... But one important problem relating to women which has been greatly and shurned is the problem of violence against women." (*Social Problems in India* : 2004 : P. 243).

সমাজবিজ্ঞানী কারলেকার (Malavika Karlekar) তাঁর *Domestic Violence* শীর্ষক রচনায় এ বিষয়ে অর্থবহ আলাচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানী বীনা দাস (Veena Das) সম্পাদিত *Handbook of Indian Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে। কারলেকার বলেছেন: "the growing ubiquity of gender-specific violence in public spaces is evident from statistics and the discourse on rape and sexual harassment at the workplace .... The sexual violation of women in times of political, communal, and ethnic strife has led to innovative analyses."

১৭.২ মহিলাদের বিরুদ্ধে নাকাল-লাঞ্ছনা (Harassment Against Woman)

ইংরেজি 'Violence' শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'নির্যাতন' কথাটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে আভিধানিক অর্থে ইংরেজী 'Violence' এবং বাংলা নির্যাতন একেবারে সমার্থবোধক শব্দ কিনা সে বিষয়ে অল্পবিস্তর দ্বিমত বর্তমান। যাই হোক এ ক্ষেত্রে 'নির্যাতন' অর্থেই 'Violence' কথাটির ব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । অধ্যাপক রিচার্ড গেলে (Rechard Gelles) তাঁর *The Violent Home*

শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, নির্যাতন বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা। এই আঘাত করার উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি করা বা তার ক্ষত সৃষ্টি করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষত বা ক্ষতি হয় না ("An act of striking a person with the intent of causing harm or injury but not actually causing it")। সমাজতত্ত্ববিদ্ স্ট্রাউস (M.A. Strauss) তাঁর *Family Patterns and Child Abuse* শীর্ষক গ্রন্থে নির্যাতনের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী নির্যাতন হল এমন এক কাজ যার দ্বারা মারাত্মক ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে ("an act where there is high potential of causing injury")। অনেকের অভিমত অনুযায়ী অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাই হল নির্যাতন (An act of a person which encroaches upon the freedom of another."—Domenach) । ভয় দেখিয়ে বা শক্তি প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বা সুনামের ক্ষতি সাধন করলে তাও নির্যাতন হিসাবে পরিগণিত হয় ("the overtly threatened or overtly accomplished application of force which results in the injury or destruction of persons or their reputation."— Megaree)। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী কেমপে (R.S. Kempe) শারীরিকভাবে আঘাত করা ও ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করাকেই বলেছেন নির্যাতন ("physically striking an individual and causing injury") । অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Social Problems in India* শীর্ষক গ্রন্থে নির্যাতনের ব্যবহারিক অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী নির্যাতন হল প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে শক্তির ব্যবহার । এর উদ্দেশ্য হল কোন মহিলার কাছ থেকে তার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কিছু কেড়ে নেওয়া। এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট মহিলার শারীরিক বা মানসিক বা উভয় ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে ["force whether overt or covert, used to wrest from an individual (a woman) something that she does not want to give of her own free will and which causes her either physical injury or emotional trauma or both."]। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বিবিধ বিষয় নারী নির্যাতন হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে । এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে অপহরণ, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, বৌ-পেটান প্রভৃতির কথা বলা যায়।

দিল্লির পুলিশ রিসার্চ ব্যুরো (Police Research Bureau) নারী নিযাতনের ঘটনাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এই দুই শ্রেণীর নারী নির্যাতন হল: (ক) ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC —Indian Penal Code)-র অধীন অপরাধসমূহ এবং (খ) স্থানীয় ও বিশেষ আইনের অধীন অপরাধসমূহ। পুলিশ রিসার্চ ব্যুরো সাতটি অপরাধকে 'ক' শ্রেণীভুক্ত করেছে। এই সাতটি অপরাধ হল: (১) ধর্ষণ, (২) অপহরণ, (৩) পণের জন্য খুন, (৪) শারীরিক ও মানসিক লাঞ্ছনা (torture) , (৫) উৎপীড়ন (molestation), (৬) ইভটিজিং এবং (৭) একুশ বছর বা তার থেকে কমবয়সী মেয়েদের আমদানি করা। ব্যুরো চারটি অপরাধকে 'খ' শ্রেণীভুক্ত কছে। 'খ' শ্রেণীভুক্ত চারটি অপরাধ হল: (১) সতীদাহ (২) পণপ্রথা, (৩) নারীদের নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা এবং (৪) মহিলাদের প্রতি অশালীন আচরণ।

ভারতের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের বিরুদ্ধে নাকাল-লাঞ্ছনা আজকের বিষয় নয়—বহুদিনের বিষয়। সামাজিক সংগঠন ও পরিবার ব্যবস্থার লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় সমাজে নারীজাতির উপর অসম্মান, নির্যাতন ও শোষণ-পীড়নের ঘটনা ঘটে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে। তবে আধুনিক ভারতে পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

বর্তমানে মহিলারা ধীরে ধীরে মানব জীবনে অপরিহার্য, শক্তিশালী এবং অর্থপূর্ণ দাত্রী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন। স্বাধীনতার পরে আমাদের সমাজে নারীশিক্ষার প্রসার, তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তথাপি এখনও অসংখ্য স্ত্রীলোক অসহায়তার শিকার হন। তাঁদের প্রহার, অপহরণ, যৌনলাঞ্ছনা, পুড়িয়ে ফেলা এমনকি মেরে ফেলা হয়।

সমাজে প্রচলিত মতাদর্শ, প্রাতিষ্ঠানিক বিবিধ রীতিনীতি ও বিদ্যমান বিবিধ প্রথা ও লোকাচার নারী নির্যাতনের পথ প্রশস্ত করেছে। সামাজিক আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত রীতিনীতির কিছু কিছু এখন নারী জাতির বিরুদ্ধে বেশ সক্রিয়। স্বাধীন ভারতে নারী নির্যাতন বিরোধী বিবিধি আইনমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। আথনীতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারেও নারী জাতির অগ্রগতি অনস্বীকার্য। এতদ্সত্ত্বেও সংবাদপত্রে নারী নির্যাতনের খবরের অভাব নেই।

১৭.৩ নারী নির্যাতনের প্রকৃতি, পরিধি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (Nature, Extent and Characteristics of Harassment Against Women)

নারীর মর্যাদা ও নারী নির্যাতনের বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। বিষয়টি হল এই যে, নারীর অমর্যাদা হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপসর্গ বিশেষ। প্রাচ্যের দেশসমূহে ত বটেই, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও বহুকাল ধরে নারী নির্যাতন বর্তমান ছিল। বিভিন্ন নারী আন্দোলন ও

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তিনটি বিশ্বনারী সম্মেলন (১৯৭৫ সালে মেক্সিকো, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেন এবং ১৯৮৫ সালে নাইরোবি)—এর পরিপ্রেক্ষিতে মানবী বিদ্যাচর্চার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। নারী নির্যাতনের পিতৃতান্ত্রিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীজাতির বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচারের ঘটনা ঘটে। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে নারী নির্যাতনের গতি প্রকৃতি। পনের দায়ে বধূ হত্যার সঙ্গে আধা সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতির সংযোগ সম্পর্ক বর্তমান। আধুনিক পশ্চিমী সমাজের এবং ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন রকম যৌন নিগ্রহের, নারী নিপীড়নের ঘটনা ঘটে।

অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Social Problems in India* শীর্ষক গ্রন্থে নারী জাতির বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিষয়গুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। নারী নির্যাতনমূলক ঘটনাসমূহের এই শ্রেণীবিভাগ হল: (১) ফৌজদারী নির্যাতন (criminal violence), (২) পারিবারিক নির্যাতন (domestic violence) এবং (৩) সামাজিক নির্যাতন (social violence)। ফৌজদারী নিযাতনের অন্তর্ভুক্ত হল ধর্ষণ, অপরহরণ, হত্যা প্রভৃতি। পারিবারিক নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত হল পণপ্রথার বলি, বৌ-পেটানো, যৌন নিপীড়ন, বিধবা ও বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার প্রভৃতি। সামাজিক নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বৌ বা শ্যালিকাকে ভ্রূণ হত্যায় বাধ্য করা, ইভটিজিং, যুবতী বিধবাকে 'সতী' হতে বাধ্য করা, পারিবারিক সম্পত্তি থেকে মহিলাদের বঞ্চিত করা, গৃহবধূকে বাপের বাড়ি থেকে আরও পণ আনতে বাধ্য করা প্রভৃতি। মহিলাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধমূলক ঘটনাবলীর পরিসংখ্যান বিবিধি সরকারী নথিপত্র সূত্রে পাওয়া যায়। নারী ধর্ষণ, নারীর বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ, যৌন নির্যাতন, ইভটিজিং, অপহরণ, গণবলি প্রভৃতি ঘটনাবলী সম্পর্কিত প্রাপ্ত নথিবদ্ধ পরিসংখ্যানের থেকে বাস্তব পরিসংখ্যান অনেক বেশি।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ রিসার্চ ব্যুরো এবং সামাজিক প্রতিরক্ষার জাতীয় সংস্থা (National Institute of Social Defence)—ভারত সরকারের এই তিনটি সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত ও সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে মহিলাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। এই সমস্ত সংস্থা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে নারী জাতির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নিপীড়ন-নির্যাতনের এক অর্থবহ চিত্র পাওয়া যায়। সম্ভত প্রতিপন্ন হয় যে, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ —এই পাঁচ বছরের সময় কালের মধ্যে প্রতি বছরই ক্রমান্বয়ে অপরাধমূলক ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত *Crime in India* গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় যে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রতি বছর এগার হাজার, অপহরণ বার হাজার, উৎপীড়ন একুশ হাজার, ইভটিজিং দশ হাজার, পণবলি পাঁচ হাজার, পীড়নমূলক ঘটনা কুড়ি হাজার । ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি (IPC—Indian Penal Code)-এর আওতায় আসে মহিলাদের বিরুদ্ধে এমন অপরাধমূলক ঘটনা গড়ে প্রতিবছর ঘটে প্রায় আশি হাজার। এর মধ্যে পঁচিশ শতাংশ ঘটনা পীড়নমূলক (torture), সাতাস শতাংশ ঘটনা লাঞ্ছনামূলক (molestation) , ইভটিজিং-এর ঘটনা তের শতাংশ, অপহরণমূলক ঘটনা পনের শতাংশ, পণবলি ছ' শতাংশ এবং ধর্ষণ চৌদ্দ শতাংশ। অধ্যাপক আহুজা প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে প্রতি সাতচল্লিশ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে; প্রতি চুয়াল্লিশ মিনিটে একবার ইভটিজিং-এর ঘটনা ঘটে; প্রত্যেক চুয়াল্লিশ মিনিটে একটি অপহরণের ঘটনা ঘটে; প্রত্যেক নব্বই মিনিটে একটি পণবলির ঘটনা ঘটে; এবং প্রত্যেক পঁচিশ মিনিটে একটি উৎপীড়নের ঘটনা ঘটে। অধ্যাপক আহুজা বলেছেন: "In 1994, the number of cases recorded were : Immoral Traffic Act : 7,547, Indecent Representation of women Act : 349, and sati Act : 2."

প্রকৃত প্রস্তাবে মহিলাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ঘটনা অধুনা অনেক অধিক সংখ্যায় নথিভুক্ত হচ্ছে। এখন নারী নির্যাতনের ঘটনাকে অধিক সংখ্যায় কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসা হচ্ছে। তা ছাড়া অন্যান্য কারণও আছে। সাম্প্রতিককালে নারী জাতির অধিকার ও লিঙ্গ-সাম্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী নির্যাতনের যাঁরা শিকার হন নতুন আইনের নিরাপত্তা পাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের আস্থা বেড়েছে। আবার আজকাল মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বেসরকারী সংগঠনসমূহের ভূমিকা, মহিলা আদালত, পরিবার আদালত প্রভৃতি সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, নারী নির্যাতন সম্পর্কিত সকল ঘটনার প্রতিবেদন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয় না এবং সকল ঘটনা নথিভুক্ত করা হয় না। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ কাজ করে। বৌ-পেটান, অজচার প্রভৃতি পরিবারের মধ্যে সংঘটিত নারী নির্যাতনমূলক ঘটনাসমূহ কম ঘটে না, কিন্তু সে সব ঘরে বাইরে কাউকে জানতে দেওয়া হয় না।

নির্যাতনের শিকার ॥ নারী জাতির মধ্যে সাধারণত কারা নির্যাতনের শিকার হয় সে বিষয়ে অধ্যাপক আহুজা তাঁর *Social Problems in India* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নিম্নোক্ত শ্রেণীর মহিলারাই সাধারণত নির্যাতনের শিকার হন:

(১) যে সমস্ত মহিলার পতিরা মদ্যপ ;

(২) যে সমস্ত মহিলার স্বামীরা দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন;

(৩) কিছু কিছু মহিলা সামাজিকতার বিচারে সাবালক নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব আছে—এই সমস্ত মহিলারা আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন;

(৪) মহিলাদের মধ্যে অনেকে অসহায় বোধ করে, হতাশাগ্রস্ত, আত্মমর্যাদাবোধ দুর্বল, আত্ম অবমূল্যায়নের শিকার, নির্যাতনকারীরা যাদের আবেগ-তাড়িত অবস্থায় সহজেই নির্যাতন করতে পারে, যারা পরার্থী ক্ষমতাহীনতার শিকার — এই শ্রেণীর মহিলারাও নির্যাতনের শিকার হন;

(৫) মহিলাদের মধ্যে অনেকে পীড়নমূলক পারিবারিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করেন, অনেকে অস্বাভাবিক প্রকৃতির পরিবারের মধ্যে বসবাস করেন,—এই শ্রেণীর মহিলারাও নির্যাতনের শিকার হন।

নির্যাতনকারীরা **পরিচিত মানুষ** ॥ নারী নির্যাতনকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্যাতীতাদের পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ। সাধারণত চেনাশুনা মানুষের দ্বারাই মহিলারা আক্রান্ত বা নির্যাতিত হন। ভারতে বৈবাহিক নির্যাতনের অভিযোগই অধিক সংখ্যায় পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এ বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সব সময় স্বামীগৃহ বা বৈবাহিক আবাসন নারীর পক্ষে নিরাপদ নয়। তবে এ কথাও বলা চলে না যে, ঘরের থেকে ঘরের বাইরে নারীরা অধিক নিরাপদ। নির্যাতনকারী পুরুষেরা এক ধরনের যুক্তি খাড়া করেন। তাঁদের অভিযোগ অনুযায়ী অধুনা মহিলারা বধূর বাঞ্ছিত ভূমিকার অনুগামী হতে অপরাগ এই অভিযোগ সত্য হলেও এ কথা আসে না যে, কতক পরিমাণে স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতার অভিলাষী হওয়ার জন্য বা গৃহবধূর সাবেকি ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার কারণে নারীকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হবে। নারী নির্যাতন নারীর কাছ থেকে অভিপ্রেত ভূমিকা আদায়ের উপায় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহুজার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "Women are generally abused and attacked by men they known. This is proved by one study even in England... which has pointed out that 61 percent of women are abused by their own family members and only 39 percent by strangers. In the former category, 72 percent face violence at the hands of their husbands by men they known well, and that too in place they would consider as safe."

অধ্যাপক আহুজা হিংসা ও অন্যায়-অবিচারকারীদের সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: (১) যারা মানসিক অবসাদগ্রস্ত, হীনম্মন্যতায় ভোগেন এবং যাঁদের আত্মসম্মানবোধ নিম্নমানের; (২) যাদের ব্যক্তিত্ব ভারসাম্যহীন এবং মানসিক অস্থিরতাজনিত ব্যাধিগ্রস্ত; (৩) যারা ধনসম্পদহীন, অদক্ষ, বোকা এবং যাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামাজিক অস্থিরতা বর্তমান; (৪) যারা অধিকারসূচক, সন্দেহবাতিক ও প্রাধান্যমূলক প্রকৃতি বিশিষ্ট; (৫) যে সকল ব্যক্তিকে পারিবারিক জীবনে পীড়নমূলক পরিস্থিতির মধ্যে কাটাতে হয়; (৬) শৈশবে যারা হিংসা ও অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছে; এবং (৭) যারা প্রায়শই মদ্যপান করে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা ও অন্যায়-অবিচারের প্রকৃতি পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক আহুজা ছয় ধরনের অন্যায়-অবিচারের কথা বলেছেন: (ক) টাকাকড়ি সম্পর্কিত হিংসা ও অন্যায়-অবিচার; (খ) দুর্বলের উপর অধিকার অর্জন সম্পর্কিত অন্যায়-অবিচার; (গ) সুখ-সম্ভোগ ভোগ সম্পর্কিত অন্যায়-অবিচার; (ঘ) অন্যায়কারীর মানসিক অবস্থাসঞ্জাত হিংসা ও অবিচার; (ঙ) পীড়নমূলক পারিবারিক অবস্থাসম্ভূত অন্যায়-অবিচার; এবং (চ) অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করার কারণে অন্যায়-অবিচার।

কয়েক ধরনের নারী নির্যাতন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। নারী নির্যাতনের এই ধরনগুলি হল: (১) ধর্ষণ, (২) পণবলি, (৩) বৌ পেটানো, (৪) বিধবাদের উপর নির্যাতন, (৫) অপহরণ এবং (৬) খুন।

(১) ধর্ষণ (Rape)

ধর্ষিতাদের সাধারণ পরিচয় ॥ ধর্ষণের ঘটনায় নারীর দৈহিক লাঞ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মর্যাদা ধর্ষিত হয়। সকল দেশেই নারী জাতির মর্যাদাবিরোধী এই ঘটনা বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী কারলেকার (Malavika Karlekar) তাঁর *Domeistic Violence* শীর্ষক রচনায় [Veena Das (ed) 'Handbook of Indian Sociology'] বলেছেন: "An alarming finding of the latest World Development Report(1993) was that, globally, rape and domestic violence account for about 5 percent of the total disease burden among women in the age group of 15-44. Disease is defined as both, physical as well as non-physical ailments." অধ্যাপক আহুজা

মন্তব্য করেছেন: 'Though the problem of rape is considered serious in all countries, in India it is statistically not as serious as it is in the western society." ভারতে কিশোরী, যুবতী, এমনকি অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলাদের উপরও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। দরিদ্র মেয়েদের উপরত' বটেই; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মরতা মহিলারাও নিয়োগকর্তাদের দ্বারা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হন। কারাগারে মহিলা বন্দীদের উপরও যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে পদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দ্বারাও নারীর বিরুদ্ধে যৌন লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে রোগিনীদের উপরও এমন ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে ঘটে। গৃহকতার দ্বারা মহিলা গৃহভৃত্যরা অনেক সময় লাঞ্ছিতা হন। দিনমজুরীর মহিলারা দালাল ও কনট্রাকটারদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হন। এমন কি ভিখারিণী এবং মূক-বধির, অন্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলারাও অনেক সময় নিষ্কৃতি পান না। নিম্নবিত্ত পরিবারের যে সমস্ত মেয়েরা রুজিরোজগারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করেন এবং পরিবার-পরিজনদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের অনেককেই মুখবুজে যৌন লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। যৌন নিগ্রহের শিকার মহিলাদের উপর সামাজিকভাবে কালিমা লেপন করা হয়। তাদের সামাজিকভাবে অসম্মান ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। অধ্যাপক আহুজা মন্তব্য করেছেন: "The victims face social stigma and disgrace and suffer serious guilt-pangs and personality disorders if they register protest."

বয়সগত বিভাজনের পরিপ্রক্ষিতে ধর্ষিতাদের বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত *Crime in India* শীর্ষক প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বর্তমান। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাধারণত ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রেই ধর্ষণের ঘটনা বেশী ঘটে। মোট ধর্ষণের ঘটনার ৬৪ শতাংশ এই বয়ঃগোষ্ঠীর মহিলাদের উপরই সংঘটিত হয়। তিরিশ বছরের অধিক বয়সের মহিলাদের উপর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ১৩ শতাংশের মত। দশ বছরের কম বয়সের মেয়েদের ক্ষেত্রে ধর্ষণের ঘটনার হার তিন শতাংশের মত। দশ থেকে ষোল বছরের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার কুড়ি শতাংশের মত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার নিরিখে পশ্চাদপদ মহিলারাই যৌন হিংসার জঘন্যতম শিকার হন। যৌন লাঞ্ছনার শিকার মহিলাদের সিংহভাগের কথা সর্বসমক্ষে আসে না। এঁরা হলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড় মানুষজন। একজন ধর্ষিতা পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধর্ষিতা হন—দ্বিতীয়বার পুলিশের কাছে এবং তৃতীয়বার আদালতে গিয়ে। ধর্ষণের তদন্ত পদ্ধতি, সাক্ষ্য গ্রহণের রীতিনীতি, জেরা করার পন্থাপদ্ধতি সবই ধর্ষিতার কাছে রীতিমত অপমানজনক। মামলার দীর্ঘসূত্রীতা, ধর্ষিতার প্রতি মনোভাব প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে, সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর প্রতি মৌলিক পক্ষপাত বর্তমান। সংশ্লিষ্ট আইনগুলি নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্যাদির অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, কিন্তু সমস্যাসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে না। আবার এই আইনগুলিই হল আধুনিককালের নারী আন্দোলনের শক্তিশালী তথা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইন আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ও অন্যবিধ যৌন পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এদেশের সমাজজীবনে যৌন হিংসার ঘটনা বাড়ছে।

পণবলি (Dowry-Death)

পণবলির ঘটনা ভারতীয় সমাজে নারীজাতির মর্যাদা বিরোধী একটি ভয়াবহ ঘটনা। সামাজিক সমস্যা হিসাবে এর অমানবিক প্রকৃতি মর্মান্তিক। পণের দাবি-দাওয়াজনিত লাঞ্ছনা ও পীড়নের কারণে বিপন্ন গৃহবধূ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আবার অতিলোভী স্বামী-দেবতা বা তার পরিজনেরা পণের কারণে গৃহবধূকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। এই সমস্যাটি কন্যার মাতাপিতা, সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, আইন-আদালত— বস্তুত সমগ্র সমাজের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬১ সালে পণপ্রথা বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আইনটি সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়নি-- সমস্যাটির অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে অবস্থান করছে। পণের জন্য দাবি পণবলির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছে। পণের দাবি করার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী বা তার পরিবার-পরিজনেদের বিরুদ্ধে জোরদার আইনী পদক্ষেপের খুব বেশি পাওয়া যায় না। অধ্যাপক আহুজা মন্তব্য করেছেন: 'Not a week passes when one does not read about a girl being harassed, tortured, killed or driven to suicide because of dowry, and yet how many of the accused are punished? Few killers in bridge-burning cases are arrested, fewer are prosecuted, and fewest finally sentenced."

অধিকাংশ ঘটনা ঘটে পতিগৃহে ॥ পণবলির অধিকাংশ ঘটনা ঘটে পতিগৃহের গোপনীয়তার মধ্যে। এ বিষয়ে পতির পরিবারের পরিজনদের স্বকীয় ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতা থাকে। সাক্ষ্য-প্রদানের অভাবের কারণে আদালত অপরাধ সাব্যস্ত করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে অসহায় বোধ করে। এ ব্যাপারে

অনুসন্ধানকারী পুলিশ অফিসারদের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে আদালত অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন তোলে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা বা দুর্নীতির কারণে পণবলির কুশীলবরা রেহাই পেয়ে যায়। তারফলে পণবলির ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

পরিসংখ্যান ॥ পণবলির পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে অধ্যাপক আহুজা বলেছেন যে, পণ না দেওয়ার জন্য বা আংশিকভাবে দেওয়ার জন্য প্রতিবছর কমবেশি পাঁচ হাজার বধূমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। পণবলির বৃদ্ধির হার দুর্ভাবনার সৃষ্টি করে। *Crime in India 1994* সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে পণবলির সংখ্যা ছিল ১,৯১২। ১৯৮৯ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪,২১৫; ১৯৯০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪,৮৩৬; ১৯৯১ সালে আবার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫,১৫৭; এবং ১৯৯৩ সালে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫,৮১৭। ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা সামান্য হ্রাস পেয়ে হয় ৪,৯৩৫।

অধ্যাপক আহুজা পণবলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

১। পণবলির শিকার প্রায় সত্তর শতাংশই ২১ থেকে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে। এই বয়সের মেয়েরা শারীরিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ক।

২। নীচু জাতের থেকে অপেক্ষকৃত উঁচু জাতের মধ্যেই এই সমস্যার আধিক্য বর্তমান।

৩। নিম্নশ্রেণীর বা উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের থেকে মধ্যশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যার শিকারের হার অধিক।

৪। বধূ হত্যার ক্ষেত্রে পরিবারের গঠন-বিন্যাসের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

৫। হত্যা বা আত্মহত্যার আগে হতভাগিনীর উপর নানা ধরনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও পীড়ন পরিচালিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পরিবারের সীমাবদ্ধতাই প্রকট হয়ে পড়ে।

৬। সংশ্লিষ্ট গৃহবধূর লেখাপড়ার মান এবং পরের কারণে তার উপর অত্যাচার-পীড়নের কোন সম্পর্ক নেই।

৭। পণবলির গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক কারণ হিসাবে অপরাধীর পরিবেশগত চাপ, পরিবারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ সঞ্জাত সামাজিক উত্তেজনাসমূহ উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে হত্যাকারীর কর্তৃত্বমূলক ব্যক্তিত্ব, প্রাধান্যকারীর প্রকৃতি এবং ব্যক্তিত্বের ত্রুটিপূর্ণ সমন্বয়ের কথা বলা হয়।

(৩) বৌ-পেটান (Wife Battering)

বিবাহিত মহিলাদের বিশেষভাবে বিরোধী আর একটি বিষয় হল 'বৌ-পেটান' (wife battering)। ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এ হল এক কলঙ্কজনক বিষয়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে সোহাগ-সম্প্রীতি পাবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ সব থেকে আস্থাভাজন সারা জীবনের সাথী স্বামী প্রকৃত অর্থে প্রহার করলে, স্ত্রীর তখন দিশেহারা অবস্থা হয়। বৌ-এর উপর বরের এ রকম সহিংস আচরণ চড়-থাপ্পড় থেকে শুরু করে লাথি, লাঠিপেটা, হত্যার হুমকি, এমনকি হত্যা পর্যন্ত হতে পারে। মারের চোটে বৌ-এর হাড়গোড় ভাঙ্গার ঘটনাও ঘটে। মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর উপর স্বামীর নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অথচ সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করে মারধর খেয়ে বৌ মুখবুজে থাকে; পুলিশ-পঞ্চায়েতের কাছে মুখ খোলে না। অবিচার-অমর্যাদা নীরবে সহ্য করে নিয়তি হিসাবে। তাছাড়া বাবা-দাদার কাছে ঠাঁই না হওয়ার আশঙ্কায় স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতা স্ত্রী মুখ খুলে না। নারীত্বের এরকম অমর্যাদা অমানবিক।

অধ্যাপক আহুজা বৌ-পেটানোর বিষয়টির উপর সম্পাদিত সমীক্ষা সূত্রে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১। স্ত্রীর বয়স স্বামীর বয়সের থেকে পাঁচ বছরের থেকে আরও কম হলে, স্বামীর দিক থেকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার অধিক আশঙ্কা থাকে।

২। পঁচিশ বছরের কম বয়সী বৌ-দের উপরই এরকম ঘটনা অধিক হারে ঘটে।

৩। পরিবারের আয়ের মান মাত্রার সঙ্গে বৌ পেটানোর সংযোগ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে বে-রোজগেরে এবং কম রোজগেরে স্বামীদের বৌদের উপর মারধরের ঘটনা অধিক ঘটে।

৪। বৌ-পেটানোর ঘটনার কারণ হিসাবে কতকগুলি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়গুলি হল স্বামীর মাদকাসক্তি, স্ত্রীর সঙ্গে যৌন বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ সামঞ্জস্য, স্বামীর অতিরিক্ত অহংভাব বা হীনন্মন্যতা, স্ত্রী নির্লিপ্ততা বা ভয়ভীতি, আবেগ-উচ্ছ্বাসগত ভারসাম্য-হীনতা প্রভৃতি।

৫। পরিবারের পরিধি এবং গঠন বিন্যাসের সঙ্গে বৌ-পেটানোর ঘটনার তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

৬। স্বামীর মারধরে বৌ-এর গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা সাধারণত ঘটে না।

৭। মদ্যপ অবস্থায় স্বামীরা স্ত্রীদের বেশি পেটায়, তা সব সময় সঠিক নয়; বরং ভিন্ন কারণে মারধরের ঘটনা বেশি ঘটে।

৮। শৈশবে হিংসার পরিবেশ-পরিমণ্ডলের অভিজ্ঞতা ব্যক্তির মধ্যে সহিংস আচরণের প্রবণতা সৃষ্টি করে।

৯। স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মারধর খাওয়া বা না খাওয়ার আশঙ্কার মধ্যে কোন সংযোগ সম্পর্ক নেই । তবে নিরক্ষর স্ত্রীদের মধ্যেই এই হার অধিক।

(৪) বিধবাদের উপর নির্যাতন (Violen Against Widows)

ভারতীয় সমাজে বিধবা মহিলাদের অমর্যাদাকর অবস্থান কম মর্মান্তিক নয়। তবে সকল বিধবার সামাজিক অবস্থান অভিন্ন, তা নয়। কম বয়সের নিঃসন্তান বিধবা, যুবতী বয়সের দু-একটি সন্তান সহ বিধবা এবং অধিক বয়সের বিধবা — এই তিন শ্রেণীর বিধবার সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণভাবে সকল বিধবাকেই আর্থ-সামাজিক ও মানসিক সামঞ্জস্যসাধনমূলক সমস্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। কম বয়সের নিঃসন্তান বিধবাদের এবং অধিক বয়সের বিধবাদের সাধারণত তেমন কোনো দায়-দায়িত্ব থাকে না। তবে তৃতীয় শ্রেণীর বিধবাদের ভূমিকার এক ধরনের কদর আছে। ছেলের পরিবারে নাতি-নাতনির দেখাশোনার জন্য এদের কিছুটা কদর থাকে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষত দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধবাদের গুরুতর সমস্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। এদর জৈবিক সমস্যা, সামাজিক প্রতিকূলতা ও পিতৃহারা সন্তানদের প্রতিপালনের সমস্যা কম গুরুতর নয়। অধ্যাপক আহুজা মন্তব্য করেছেন: "A widows economic dependence is a severe threat to herself esteem and her sense of identity. The low status accorded to them by their in lows and others in the faimily roles lowers their self-esteem. The stigma of widowhood itself negetively affects a woman and she falls in her own esteem."

সাধারণভাবে সকল বিধবাদের সামাজিক অবস্থান বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, তাদের উপর অন্যায়-অমর্যাদার অবধি নেই। বিধবাদের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা ও অমর্যাদামূলক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মারধর করা, অকথা-কুকথা বলা, মানসিকভাবে নির্যাতন চালানো, সম্পত্তিতে আইনসম্মত অংশ থেকে বঞ্চিত করা, যৌন অত্যাচার করা, বিধবার সন্তানদের উপর অন্যায়-অবিচার কায়েম করা প্রভৃতি। একটি সময় ছিল যখন হিন্দু বিধবাদের কাশীবাসী করা হত । কাশীবাসী বিধবাদের দুরবস্থার কথা অজানা নয়।

বিধবাদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারমূলক ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয় উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক আহুজা এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১। বিধবাদের বিরুদ্ধে শোষণ-বঞ্চনার ঘটনা ঘটে সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে— ক্ষমতা, সম্পত্তি ও যৌনাচার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিধবাদের সাধারণত সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। নিচু শ্রেণীর বিধবাদের উপর যৌন অত্যাচার অধিক মাত্রায় ঘটে। ক্ষমতার ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার সকল বিধবাদেরই হতে হয়।

২। বিধবাদের বঞ্চনার বিষয়টির সঙ্গে বয়স, শিক্ষা ও শ্রেণীগত অবস্থানের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু পরিবারের গঠন ও পরিধির সঙ্গে এই বিষয়টির তেমন কোন নিবিড় সংযোগ নেই।

৩। বিধবাদের নির্লিপ্ততা ও ভীরুতা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দায়ী। তবে কর্তৃত্বপরায়ণ প্রতিপত্তিশালী শাশুড়ীর নজিরও কমবেশি আছে।

৪। প্রধানত পরলোকগত পতির পরিবারের সদস্যদের দিক থেকেই বিধবাদের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ঘটনা ঘটে।

৫। প্রয়াত পতির ব্যবসা, বিষয়সম্পত্তি, বীমাপত্র ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ সম্বন্ধে বিধবাদের সাধারণত বিশেষ কিছু জানা থাকে না। স্বভাবতই প্রয়াত পতির পরিবারের অসাধু ও লোভী সদস্যরা সহজেই বিধবাদের সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

৬। মধ্য বয়স্ক বিধবাদের থেকে কম বয়সী বা যুবতী বিধবারা অধিক পরিমাণে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও শোষিত হয়।

ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা, পণবলি, বৌ-পেটানো, বিধবা-নির্যাতন প্রভৃতি মহিলাদের উপর হিংসা ও অন্যায়-অবিচারের পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রামচন্দ্র আহুজা নির্যাতনের শিকার মহিলাদের সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সাধারণত নিম্নোক্তশ্রেণীর মহিলারা নির্যাতনের শিকার হন।

১। যে সমস্ত মহিলা সাধারণত অসহায় বোধ করেন, হতাশাগ্রস্ত, নিম্নমানের আত্মমর্যাদাবোধযুক্ত এবং আত্ম অবমূল্যায়নের শিকার তাদের নির্যাতিত হতে দেখা যায়।

২। যে সমস্ত মহিলা অন্যায়-অবিচারকারীদের দ্বারা অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত হল অথবা পরার্থী ক্ষমতাহীনতার শিকার, তাঁরাও অন্যায়-অবিচারের শিকার হন।

৩। যে সকল মহিলা পীড়নমূলক পারিবারিক অবস্থায় বসবাস করেন অথবা এমন পরিবারে বসবাস করেন, সামাজিক বিচারে যে সমস্ত পরিবারকে স্বাভাবিক বলা যায় না — তাঁদেরও অন্যায়-অবিচারের শিকার হতে দেখা যায়। সমাজতাত্ত্বিক বিচারে অস্বাভাবিক পরিবার বলতে সেই সমস্ত পরিবারকে বোঝায়, যে পরিবারের জীবিত মাতাপিতারা একসঙ্গে বসবাস করেন না; পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক ও গৌণ প্রয়োজনসমূহ পরিপূরিত হয় না; পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাধারণত ঝগড়া-ঝাটি হয় না; এবং যে সমস্ত পরিবার নৈতিক বিধি-ব্যবস্থার অনুগামী।

৪। সামাজিক পরিপক্বতা বা সামাজিক আন্তর্ব্যক্তিক বিচক্ষণতার অভাবজনিত কারণে যে সকল মহিলা আচার-ব্যবহার জনিত সমস্যার সম্মুখীন হন, তারাও নারী নির্যাতনের শিকার হন।

৫। যে সকল মহিলার পতি ও পরিজনেরা অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের শিকার তাঁরাও নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন।

৬। স্বামী মদ্যপ হলে স্ত্রীর উপর নির্যাতন নেমে আসে।

(৫) অপহরণ (Kidnapping or Abduction)

অপহরণ দু'ধরনের হতে পারে। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে চলে যাওয়া হল এক ধরনের অপহরণ। এ ধরনের অপহরণের ক্ষেত্রে অপহৃত ছেলে বা মেয়ের সম্মতি অনাবশ্যক। এ রকম অপহরণকে ইংরেজীতে বলে 'Kidnapping। আর এক ধরনের অপহরণ হল প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে অপহরণ। জোর করে, চক্রান্ত করে, ছলনা করে বা ফুসলিয়ে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অপহৃতার সম্মতির কারণে অপহরণের অপরাধ মুকুব হয়ে যায়। এ ধরনের অপহরণ ইংরেজীতে 'abduction' হিসাবে পরিচিত।

১৯৯৩ প্রকাশিত *Crime in India* শীর্ষক প্রকাশনায় ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের সময়কালের মধ্যে অপহরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায় । প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দিনে গড়ে তেত্রিশ জন মেয়ে বা মহিলাকে অপহরণের ঘটনা ঘটে । প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যা পিছু দুটি করে অপহৃণের ঘটনা ঘটে। অপহৃতদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যার তুলনায় মেয়ের সংখ্যাই অধিক। অপহৃত মোট ছেলে-মেয়ের মধ্যে শতকরা হিসাবে মেয়েরা ৮৭ এবং ছেলেরা ১৩।

অধ্যাপক আহুজা অপহরণ সম্পর্কিত একচল্লিশটি ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অধ্যাপক আহুজা অপহরণ সম্পর্কিত কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। (ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনই অপহরণ করে। এই কারণে অপহরণকারীর দিক থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং অপহৃতার দিক থেকে বাধা দানের উদ্যোগ সাধারণত থাকে না। (খ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপহরণকারী এবং অপহৃতা পরস্পরের পরিচিত। (গ) অপহরণকারী এবং অপহৃতার মধ্যে সংযোগ- সম্পর্ক এবং অপহৃতার বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার পিছনে কারণ থাকে। এ রকম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের মধ্যে মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব থাকে । (ঘ) সাধারণত পাড়ার মধ্যে বা নিজেদের ঘরে অপহরণকারী ও অপহৃতার মধ্যে প্রাথমিক সংযোগ-সম্পর্ক ঘটে। (ঙ) অপহরণের আশি শতাংশেরও অধিক ক্ষেত্রে সংযুক্ত থাকে যৌন অত্যাচারের ঘটনা। (চ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহিতা মহিলাদের তুলনায় অবিবাহিতা মেয়েরাই অপহরণের শিকার হয়। (ছ) অপহরণের পিছনে সাধারণত দুটি মূল উদ্দেশ্য থাকে। এই দুটি উদ্দেশ্য হল যৌন কামনা ও বিবাহের বাসনা।

(৬) খুন (Murder)

ভারতে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে খুনের ঘটনাও কম ঘটে না। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় বিচারে নারী-পুরুষ ভেদে তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে অধ্যাপক আহুজা তেত্রিশটি খুনের ঘটনার ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সমীক্ষাসূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসমূহ পর্যালোচনা করে তিনি এ বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) ছোটখাট পারিবারিক ঝগড়াঝাটি, অবৈধ সম্পর্ক, এবং মহিলার সুদীর্ঘকালীন অসুখ-বিসুখ মহিলাদের

খুন হওয়ার পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে। (খ) খুন মূলত পুরুষদের একটি অপরাধ। খুনী পুরুষের সঙ্গে খুন হওয়া মহিলার সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঁচ বছরের অধিককালের । (গ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুনী পুরুষ এবং খুন হওয়া মহিলারা একই পরিবারের সদস্য। (ঘ) খুন হওয়া মহিলাদের প্রায় অর্ধেকের সন্তান থাকে। (ঙ) খুনীদের প্রায় আশি শতাংশ ২৫ থেকে ৪০ এই বয়ঃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় আশি শতাংশ ক্ষেত্রে অপর কারও সাহায্য ছাড়াই খুনী খুন করে। (চ) তাৎক্ষণিক রাগ বা আবেগ-উত্তেজনার মুহূর্তে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। (জ) খুনীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের পেশার মানুষ ও কম রোজগারের মানুষ।

নারী নির্যাতনের পিছনে প্রেরণাসমূহ (Motivations behind violence)

নারী নির্যাতনের পিছনে বিভিন্ন কারণ কাজ করে। নারী নির্যাতনের পিছনে ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য বা প্রেরণাসমূহের ভিত্তি হিসাবে কতকগুলি বিষয়ের কথা বলা হয়। এই বিষয়গুলি তিন শ্রেণীর: (ক) নির্যাতিতাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ, (খ) নির্যাতনকারীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং (গ) হিংস্র আচরণের জন্য দায়ী অবস্থাসমূহ ।

নারী নির্যাতনের পিছনে বহু ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা প্রেরণার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক আহুজা এই সমস্ত কারণকে চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। নারী নির্যাতনের এই চার শ্রেণীর কারণ হল: (১) প্রমত্ততা (intoxication), (২) নির্যাতিতার প্ররোচনা (victim's provocation) , (৩) অবস্থাগত জেদ (situational urge), এবং (৪) নারী-বিরোধিতা (hostility towards women) ।

(১) প্রমত্ততা (Intoxication)

মদ্যপ অবস্থায় পুরুষ মানুষ বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটায়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যৌন অত্যাচারের ঘটনায় স্থান-কাল, পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল সম্পর্কে কোন রকম হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মদ্যপ অবস্থায় মানুষ অত্যন্ত উত্তেজিত ও আক্রমণমুখী অবস্থায় থাকে। সে অবস্থায় সম্পাদিত কাজকর্মের ফলাফল সম্পর্কে কোন রকম অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা বোধ কাজ করে না। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মানুষ মাতাল হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত আবেগ-উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়। আচার-আচরণের উপর স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তখন আর থাকে না। এ রকম মাতাল অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে যৌন উত্তেজনা। তখনই মানুষ কাণ্ডজ্ঞান-রহিত হয়ে পড়ে এবং ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটায়। বৌ-পেটানোর ঘটনাও সাধারণত মদ্যপ অবস্থাতেই সংঘটিত হয়।

নারী নির্যাতনমূলক আচরণের জন্য মদ্যপানকে সরাসরি দায়ী করা যায় কিনা সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। এমন কথাও বলা হয় যে, আগে থেকেই থাকা হিংসাত্মক আচরণের প্রবণতা মদ্যপ অবস্থায় প্রকাশিত হয়ে যায়। আবার এও বলা হয় যে, দুষ্কৃতিরা দুষ্ক্রিয়ামূলক কাজকর্ম সম্পাদনের উপযোগী উদ্যোগ-উত্তেজনা অর্জন করার জন্য অধিক মাত্রায় মদ্যপান করে। তবে এমন কথা নিতান্তই অমূলক যে, হিংস্র আচরণের জন্য কেবলমাত্র মদ্যপানই দায়ী। মদ্যপান সত্ত্বেও হীংস্র আচরণ করেন না এমন মানুষের অভাব নেই। তবে নারী নির্যাতনের সঙ্গে মদ্যপানের একটা সহযোগিতামূলক সম্পর্কের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহুজা মন্তব্য করেছেন: "The use of alcohol in violence against women may, therefore, be accepted as 'cooperative' factor rather than the 'chief factor'."

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে মাতাল ব্যক্তিটির শারীরিক অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে, অপর কারুর উপর চড়াও হওয়ার সামর্থ্য সেই মাতালের আর থাকে না। কিন্তু রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ যদি এমন হয় যে, নিজের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য বজায় থাকে, তখনই নির্যাতনমূলক আচরণের আশঙ্কা দেখা যায়।

(২) নির্যাতিতার প্ররোচনা (Victim's Provocation)

নির্যাতিতা অনেক সময় নিজের আচার-আচরণের দ্বারা অসচেতনভাবে নির্যাতনের অনুকূল পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে। নির্যাতনকারীর হিংস্র আচরণকে নির্যাতিতাই অনেক সময় টেনে বের করে নিয়ে আসে। অর্থাৎ নির্যাতিতার ভূমিকাই নির্যাতনকারীর হিংস্র স্বভাবের বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। তার ফলে আক্রমণমুখী আচরণের অভিব্যক্তি ঘটে। এইভাবে বৌ-পেটান, অপহরণ, ধর্ষণ, বিধবাদের নির্যাতন এমন কি খুন-খারাপির ঘটনাও ঘটে।

ধর্ষণকারীদের মধ্যে অনেকেই ধর্ষিতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা সৃষ্টিমূলক বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আনেন। এই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ আহ্বান; নাছোড়বান্দাভাবে চালিয়ে গেলে তাকে পাওয়া যাবে এমন ইঙ্গিত; কথাবার্তা ও পোষাক-পরিচ্ছদের

মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ আহ্বান প্রভৃতি। ধর্ষণকারীদের এ ধরনের অভিযোগ সঠিক নাকি মনগড়া, সে স্থির সিদ্ধান্তে আসা মুস্কিল।

বৌ-পেটানোর মত নির্যাতনকারীরা বৌ-এর বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক বিবিধ অভিযোগের কথা বলেন। এই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: পতির মাতাপিতা ও ভাইবোনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ; গুরুজনদের অবজ্ঞা-অবহেলা; পরিবারের কাজকর্মে অনাগ্রহ; স্বামীর পিছনে খিটখিটে আচরণ; পতির আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে রূঢ় আচরণ; পতি পছন্দ করে না এমন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা; অন্য কারও সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক; ঝগড়াটে স্বভাব; স্বামীর কাজকর্মে অতিরিক্ত খবরদারি প্রভৃতি।

অপহরণের ঘটনায় অনেক অপহরণকারী এমন অভিযোগ তোলে যে, অপহৃতা স্বেচ্ছায় অপহরণকারীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। তারপর মা-বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর মা-বাবার চাপে অপহরণের অভিযোগ উত্থাপন করে।

হত্যার ঘটনার ক্ষেত্রেও অনেক সময় হত্যাকারী হত মহিলার বিরুদ্ধে প্ররোচনার অভিযোগ আনে। অভিযোগ করা হয় যে, তর্ক ও উত্তেজিত কথা কাটাকাটির মাধ্যমে হত মহিলাই হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে।

(৩) অবস্থাগত জেদ (Situational Urge)

অবস্থাগত কারণও নারী নির্যাতনের পিছনে ক্রিয়াশীল হতে পারে। হঠাৎ করে সৃষ্টি হওয়া কোন সুযোগের পরিণামে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, বাড়ি থেকে পালিয়ে কোন যুবতী রাস্তায় এসে যদি কোন ট্রাক-ড্রাইভারকে অনুরোধ করে ট্রাকে উঠে পড়ে, সে ক্ষেত্রে ট্রাক-ড্রাইভার অনুকূল পরিস্থিতি পেলে যৌন লালসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে প্ররোচিত বোধ করতে পারে এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে পারে। তেমনি আবার টাকাকড়ি নিয়ে বা স্বামীর স্বজনের সঙ্গে অনাত্মীয়মূলক আচরণ নিয়ে ঝগড়াঝাটি বা কথা কাটাকাটির পরিণামে বৌ-পেটানোর ঘটনা ঘটতে পারে। অফিস ছুটির পরে বিকেলে বা সন্ধ্যায় ফাঁকা অফিস ঘরে ঊর্ধ্বতন উচ্চপদস্থ অফিসার অধঃস্তন যুবতী কর্মচারীর সঙ্গে খোসগল্পের অবসরে অতিরিক্ত সুযোগ নিতে পারেন। এই সমস্ত নির্যাতনকারীদের নারী নির্যাতনের ব্যাপারে কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না। কিন্তু তারা সহায়ক সুযোগ-সুবিধা পেয়েই হিংসাত্মক আচরণের ব্যাপারে প্ররোচিত হয়ে পড়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা কিন্তু বিচ্যুত ব্যবহারের দাগী অপরাধী নয়।

(৪) নারী বিরোধিতা (Hostility Towards Women)

কোন কোন পুরুষের মধ্যে দৃঢ়মূল নারী-বিদ্বেষ বর্তমান থাকে। এই নারী বিরোধিতার কারণেই তারা নারী নির্যাতনমূলক কাজকর্মের সামিল হয়। কোনভাবেই নারী বিরোধিতার পথ থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে আসা যায় না। এ রকম নারী বিদ্বেষী পুরুষদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক আহুজা বলেছেন: "A few of them had deeply entrenched feelings of hate and hostility for women that their violent act could said to be primarily directed towards the humiliation of the victim."

১৭.৪ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি (Preventive Measures)

নারীর সম্ভ্রম বিরোধী আচরণ, ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনমূলক অপরাধের জন্য শাস্তির বিধি-ব্যবস্থা আছে । ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪,৩৭৫ এবং ৩৭৬ ধারায় যথাক্রমে ধর্ষণের প্রচেষ্টা ও যৌন নিপীড়নের মাধমে নারীর সম্ভ্রমের উপর আঘাত, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আবার যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত মামলা কীভাবে চলবে সে বিষয়ে বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে ফৌজদারী কার্যবিধিতে। তেমনি আবার সাক্ষ্য গ্রহণের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নিয়মনীতির উল্লেখ আছে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনে। ভারতীয় সংবিধানে ১৪ থেকে ১৮ ধারার মধ্যে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী সুপরিণত একটি আইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের বিরুদ্ধে সকল রকম বৈষম্যদূরীকরণের ব্যাপারে দাবী সনদ গ্রহণ করে। এই দাবী সনদের প্রতি ভারত সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

সংবিধানে ও বিদ্যমান আইনব্যবস্থায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত আদর্শ ব্যবস্থার কথা আছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয় এই আদর্শ ব্যবস্থাকে ঢেকে ফেলছে। এই বিষয়গুলি হল আইনের জটিলতা ও মারপ্যাঁচ, আদলতে বিচারকার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় কূটকাচালি, পিতৃতান্ত্রিক আচার-আচরণের অস্তিত্ব প্রভৃতি। এরকম পরিস্থিতি পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে নারীজাতির বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারের মোকাবিলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনগুলিকে কার্যকর করা সহজসাধ্য নয়। এই সমস্ত আইনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্যকভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

নারী জাতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ঘটনা ঘটে। এই সমস্ত বৈষম্যমূলক ঘটনার কারণে নারী নির্যাতনের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত ঘটনাকে আইনমূলক অপরাধ হিসাবে প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন। এসব বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে নারী-আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। পরিবারকেও নারী আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিদ্যমান আইন বিধিব্যবস্থা এবং তার বিলিব্যবস্থার দিকে নতুনভাবে নজর দেওয়া দরকার।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পরিবারের মধ্যে মেয়েদের উপর সংঘটিত নির্যাতনমূলক কার্যকলাপকে 'ঘরের আভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসাবে জাহির করে বাইরের কাউকে নাক গলাতে দেওয়া হত না। তাই পুলিশের কাছে নালিশ করেও কিছু হত না। নারী-হিতৈষীদের কাছেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হতে সময় লেগেছে। "Committee on the status of women in India" মহিলাদের মর্যাদা প্রসঙ্গে একটি অসামান্য দলিল প্রকাশ করে। এই দলিলটি 'Towards Equality' নামে পরিচিত। ভারতের নারী সমাজ এই বিশিষ্ট দলিলটি সমেত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নারীদশকে প্রবেশ করে। এই দলিলটিতে আইনমূলক অংশটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে মানবীবিদ্যার চর্চার এবং নারী আন্দোলনের পথে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দশক এবং ঘরে বাইরে নিরন্তর নারী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী জাতির উপর অবিচার-অত্যাচারের ক্ষেত্রসমূহকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। বহু ও বিভিন্ন নারী সংগঠন এই কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই সমস্ত নারী সংগঠনের মধ্যে সাবেকী সমাজসেবী সংগঠন আছে; আছে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত সংগঠন; আবার আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত সংগঠন। বর্তমান ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নারী নির্যাতন মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইনমূলক সাহায্য সহযোগিতার উপর এই সমস্ত সংগঠন জোর দেয়।

বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বিভিন্ন পারিবারিক আইন ব্যবস্থা বর্তমান। নারী জাতির বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক আচার-আচরণের পিছনে এই সমস্ত আইনের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এই সমস্ত আইন 'ব্যক্তিগত আইন' (Personal Laws) হিসাবে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শব্দটির ব্যবহার বিভ্রান্তিমূলক। এই সমস্ত আইন ফৌজদারী আইনের মত গোষ্ঠী-ধর্ম-নির্বিশেষ সকলের উপর প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এই সমস্ত আইনকে কুক্ষীগত করেছে।

স্বাধীন ভারতে ১৯৪৫ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। বিভিন্ন ধরনের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির অধিকারের দাবীও এই সংস্কারের পিছনে সক্রিয় ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকলের জন্য সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ন্যায়বিচার সুনির্দিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। সকলের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও সমমর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সকলের সমমর্যাদার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। সংবিধানের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত তৃতীয় অধ্যায়ে, বিশেষ সাম্যের অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলিতে সকলের সমমর্যাদার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

নারী নির্যাতন মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন আইন বর্তমান। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইনগুলি সম্যকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে কতকগুলি কারণকে সনাক্ত করা হয়। বিবাহ সম্পর্কিত আইনে স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন অবস্থানের কথা আছে। পতি-পত্নীকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু শিক্ষা ও সাবলম্বনগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত নয়। — তুলনামূলক বিচারে স্ত্রী নিম্নতন অবস্থায় অবস্থিত। সাবেকী পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে পুরুষেরা এখনও সর্বাংশে মুক্ত নয়। তবে ইতিমধ্যে মহিলাদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগ্রত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা ও সংস্কারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব চাপা থাকছে না। শিক্ষা, জীবিকা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসমূহে নর-নারীকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে হবে। সুস্থ শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য সদর্থক আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। তা হলে নারী নির্যাতন, বিরোধী আইনগুলিকে কার্যকর করা সম্ভব হবে। সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। বিশেষত নারী-শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। তা হলে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং এই পথে নারীর অধিকারী সমূহের বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হবে।

নিপীড়িত নারীকে সমাজব্যবস্থায় সুসামঞ্জস্যের জন্য, শিক্ষা কর্মসংস্থান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা দরকার। তাঁকে সমর্থন ও নিরাপত্তা প্রদান করা প্রয়োজন। দেখতে হবে যে পরিবার, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং সঙ্গীসাথীদের দ্বারা তিনি যেন অবহেলা-উপেক্ষার পাত্রী না হয়ে পড়েন। সর্বশেষে তাঁকে ধর্মীয় সান্ত্বনা, সমাজের প্রতি রুখে দাড়ানোর সাহস প্রভৃতি সহমর্মিতার সাথে প্রদান করতে হবে।

দুটো প্রধান প্রশ্ন দেখা যায় যে, অপরাধীকে কি শাস্তি প্রদান করা হবে? এবং দ্বিতীয়ত মহিলাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

আবার আলোচনা হয়েছে সমাজ কী অবহেলিতা নিপীড়িতা মহিলাদের কোনো সাহায্য, সহানুভূতি দিতে পারবে?

তবে দেখা গেছে সরকারী ও বেসরকারী মহিলা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছে। তারা অত্যাচারী মহিলাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা, সমর্থন ও উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। তারা উপদেশ দিয়েছে যে মদ্যপ স্বামীর ঘর যেন সে ত্যাগ করে। সেটা সাময়িক বা চিরদিনের জন্য হতে পারে। অবশ্য যদি কোন আশ্রয় সে পায়। কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এ ধরনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে অন্তত কিছুদিনের জন্য নিপীড়িতা মহিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা দরকার।

তাছাড়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করে তোলা প্রয়োজন। তাঁদের আদালতে নামমাত্র পারিশ্রমিকে মামলা চালাতে সাহায্য করা দরকার। বর্তমানে এ দেশে পারিবারিক আদালত গঠিত হয়েছে। এই আদালতসমূহে মহিলাদের সমস্ত ধরনের সমস্যাদির সমাধান করা বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের আদালতের বিচারক, উকিল প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ও উৎসাহ মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে নিয়োজিত থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা আইন-আদালত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। তাই মহিলা বিচারপতি ও উকিল দেখে তারা এ ব্যাপারে মনে অনেক সাহস পান।

আবার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহিলাদের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি থাকা আবশ্যক। ঐক্যবদ্ধ না হয়ে যদি একা কোন মহিলা কোন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন, তখন তার ধার ও ভাব থাকে না, এই কারণে মহিলাদের একত্রিত হয়ে সমন্বিত ও সুসংহত হওয়া দরকার। মহিলাদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে সংগঠিত হওয়া দরকার।

প্রচার মাধ্যমকেও নিপীড়িতা মহিলাদের সমর্থন করা উচিত। তাতে তাঁরা তাঁদের সাহায্যের ও সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, মহিলার মাতা-পিতাকে আরও সংশোধিত হতে হবে। বদলাতে হবে তাঁদের মনোভাব। কারণ বিবাহিতা ও বিধবা মহিলাদের পতিগৃহে থাকার জন্য তাঁরা চাপ দেন, যেখানে তারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিতা, তাঁদের আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে পতিগৃহে অবস্থানে বাধ্য হন। যখন তাঁরা (মাতাপিতা) তাঁদের মেয়ের অত্যাচারের বিষয়ে অবহিত হন, তখন নিপীড়িত বিবাহিত বা বিধবা কন্যাকে সাময়িকভাবে নিজেদের সঙ্গে বসবাসের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। তাঁদের কন্যার সামাজিক কলঙ্ক ও ত্যাগের বিষয়টিকে নিজেদের পরিবারের পক্ষে প্রতিকূল বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্যায়-অবিচারের শিকার বিবাহিত বা বিধবা নারীর পাশে দাঁড়াতে হবে পিতামাতা ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের। সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁদের সচেষ্ট হতে হবে। এই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাঁদের জীবনে আশাবাদী হতে হবে। বাঁচার জন্য জীবনে নতুন প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হবে।